এই অসময়

পরিচ্ছেদ–এক

১

এক ধরনের বিদেশী পিঁয়াজ মাঝে মাঝে বাজারে আসে যার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে তবেই শাঁসের সন্ধান পাওয়া যায়। ভালো সময় সমাজের মানুষগুলো অন্যরকম, যেন কাশ্মীরি ডেলিসিয়াস আপেল। অমৃতি আপেলের মত এরা সাদাটে নয়, ভারি সুন্দর দেখতে যদিও তেমন টেস্টি নয়।আমি জানিনা আমার গল্পের চরিত্র তপন এদের মতো কিনা। তপন এখন মাঝ বয়সী বুড়ো। বিপ্লবী হওয়ার মত চারিত্রিক দৃঢ়তা তার কোন দিনই ছিল না। মাথার উপর কেউ বন্দুক ধরলে হয়তো মিথ্যে কথাগুলো সত্যি বলে চালিয়ে দিতে পারে অতি সহজে। তবুও তপন কে এই সময়ে সততার মাপকাঠি বলা যেতে পারে।তপন যদিও নিজেকে সাধারনের পর্যায়েই ফেলে। সে ভাবতো মাঝে মধ্যে, ইসস যদি ফিরে আসত ছোটবেলা আর একবার, দামাল গুলোর সাথে কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে দৌড়ে বেড়াতাম পৃথিবীময়,এই অসময়ে। যুগে যুগে সততার মাপন যন্ত্র পাল্টে যায়। অতীতে ভগৎ সিং সময়ের নিরিখে সততার মানদন্ড হলেও এই সময়ে তপনের মানদন্ডে মানুষ মাপা চলে। তপন মরতে ভয় পায় না কিন্তু যন্ত্রণাহীন মৃত্যু জীবনে তার একান্ত কাম্য। তাই আর যাই হোক তপন কে বিপ্লবী বলা যায় না ,এ সত্য অন্যর অজানা হলেও সে নিজে অনুভব করে।

সারা দুনিয়ায় মৃত্যু মিছিল চলেছে করোনা ভাইরাসের আগ্রাসনে, সারা পৃথিবীর ভয়ার্ত রূপ ধরা পড়ে যাচ্ছে মানুষের চোখে ।ঘর থেকে কেউ বেরোচ্ছে না। স্তব্ধ চরাচর,তারই মধ্যে ধর্মের ধ্বজাধারী কিছু উজবুক জমায়েত হচ্ছে মসজিদে, মন্দিরে ছড়াচ্ছে ভাইরাস। তটস্থ দুনিয়া সন্দেহ করছে নিজের প্রতিবেশী ভাই-বোন এমনকি সন্তানকেও। প্রথমে একটু হালকা চালে নিয়েছিল তপন এই ঘটনা প্রবাহকে। যদিও সে নিজেকে আপডেটেড রেখেছিলেন সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে।মড়কের ভয়ে ভীত তপন কোনদিনই ছিল না। তার ভাবনা ছিল এই সময়ে শ্রমজীবী মানুষের দুরবস্থা নিয়ে। করোনা আতঙ্কের ঠিক শুরুতেই তপনের বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন ভীষণভাবে। পেচ্ছাপ দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে যা থামতেই চায় না ।তাড়াহুড়ো করে সার্জন দেখিয়ে তপন বাবাকে ভর্তি করে হাসপাতলে। বাবা, যিনি তাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিলেন,মানে চোখের আলো, জীবনের বিশ্বাসগুলো প্রোথিত করেছিলেন মনের গভীরে সেই বাবা।এত বয়সে প্রেসেন্ট কে অপারেশন করা যায় না। তবু ডাক্তার এবং তপন সহমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে জীবনে বাঁচতে হলে বাঁচার মতো বাঁচতে হবে, মরে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। এ শিক্ষা তপন বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিল। করোনার আগ্রাসন রুখতে পুলিশ মাঠে নেমে পড়েছে আর স্বাস্থ্যকর্মীরা লড়াইয়ের ইতিহাস গড়তে নেমে পড়েছে হাসপাতালে, হাসপাতালে। এ এক না দেখা আজব দিন।

২

প্রায় বছর দশেক আগেকার কথা, তপনের জ্যাঠামশাই এর প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড বড় হয়েছিল। সরকারি ডাক্তার ফেরত দিয়েছিল এই বলে যে এই বয়সে কাম্য নয় অপারেশন। সেই থেকে ক্যাথিটার নিয়ে তপনের জ্যাঠামশাই দিব্য বেঁচে আছেন, রীতিমত লেখাপড়ার মধ্যে। তপনের বাবা বড্ড তেঁরেটে লোক, তিনি ওরকম বাঁচা বাঁচতে চান না। ওনার এইরকম পজেটিভ জীবন-দর্শন তপনের জীবনে রীতিমত প্রভাব ফেলেছিল। বাবাকে এই ভেবে হাসপাতালে ভর্তি করে তপন যে বাবার মত আছে। বাবা ছেলেদের বড় আঘাত দিতে চায়না তাই মুখে কিছু বলেননা, এবার হয়ত উনি চান নি হাসপাতাল যেতে। এ হাসপাতালটাকে ঠিক হাসপাতাল বলা যাবে না যেন মানুষের জন্য কাজ করার এক মঞ্চ। হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় ডাক পড়ে হাসপাতাল থেকে আপনার বাবাকে ভেন্টিলেশনে দিতে হবে, তাড়াতাড়ি আসুন। এক ছুটে চলে যায় তপন, গিয়ে দেখে দক্ষযজ্ঞ চলেছে,বেশ কয়েক জন স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে মৃত্যুর পরোয়ানার বিরুদ্ধে। অবাক হয়ে তপন দেখতে থাকে ।ডাক্তার তপন কে জিজ্ঞেস করে 'এখনো ভেন্টিলেশনের দিইনি আপনি যদি মত দেন?' তপন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করে 'আমি কি ডাক্তার যা ভালো বোঝেন করুন।' লেগে পড়ে টিম মুহূর্তের নির্দেশ পেয়ে। ভেন্টিলেশন সম্বল করে প্রানের সাড়া পাওয়া যায়, শরীরের দপ দপ চলা জানান দিতে থাকে মনিটর ।

পরিচ্ছেদ- ২

বিকাশ শর্মা সরকারি কাজে মহারাষ্ট্র তে গেছে।বিকাশ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী। এমন একটি কাজে তিনি গেছেন যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত, জীবনযাত্রা জড়িয়ে আছে। কাজটি সমাধা করে বিকাশ ফিরে আসে। এসে দেখে তার কন্যা অসুস্থ। অসুস্থতা, সাধারণ মানুষের ঘরে যে রকম হয় জ্বরজ্বালা ,মাথাব্যাথা এই আর কি। বিকাশ মেয়েকে নিয়ে যায় হাউস ফিজিশিয়ান এর কাছে। ডাক্তার নিদান দেয় ভাইরাল ফিভার। নিদান পেয়ে বিকাশ মেয়েকে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘরে চলে যায়। চলতে থাকে এন্টিবায়োটিক ঘুমের ওষুধ আরো কত কি? জ্বরের প্রকোপ কমে না ভুল বকতে থাকে মেয়ে ।ততদিনে করোনার কারণে লকডাউন ঘোষণা হয়েছে দেশে। পৃথিবীর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ভারত বর্ষ লাগু করেছে বন্ধ। প্রাথমিকভাবে ট্রেন-বাস চললেও কয়েকদিনের মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথমবার ট্রেন চলাচল সার্বিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, বন্ধ হয় কল কারখানা । মফস্বলের ফ্ল্যাট বাড়ীতে জানালায় বসে প্রকৃতির পাঠশালায় পাখির কাকলি শোনা যায় এখন। রাস্তায় শুধু কুকুর-বিড়ালের মেলা ।কুকুরগুলো হয়তো বা ভাবছে কি হলো রাস্তায় লোকজন নেই কেন,মানুষগুলো কি পালিয়েছে কোথাও? টান পড়েছে ওদেরও খাবারের ভান্ডারে , অদ্ভুত এই অভিজ্ঞতা ওদের জীবনেও কখনো আসেনি। তাই হঠাৎ করে রাস্তার মধ্যে এক আধজন মানুষের চলাচল রাতের বেলা ঘটলে ওদের কাছে আগন্তুক তারা ।ওদের দুনিয়া আর মানুষের হাতে ছেড়ে দিতে চায় না সারমেয় কুল। এমনই এক সন্ধ্যায় অসুস্থ হয়ে ভুল বকতে থাকে অনিতা চিনতে পারেনা ভাইবোন, বাবামা কাউকে,অনিতা বিকাশের মেয়ে। তপন কে বিকাশ ডাক দেয়। তপন তখন বাবার কাছে হাসপাতলে। বিকাশ,তপন কে বন্ধু ,গার্জেন মানতো। তপন বিকাশকে বলে 'তুমি এক্ষুনি হাসপাতালে ভর্তি করো।' বিকাশ ভেবে পায়না এই দুঃসময়ে যানবাহন ছাড়া কিভাবে অসুস্থ কন্যাকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছাবে? কোনরকমে পাঁজাকোলা করে বিকাশ আর তার স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে রাস্তায় নামে যেখানে এক পাল কুকুর প্রহরারত। কি অদ্ভুত, কুকুরগুলো অবাক দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে একবারও ঘেউ ঘেউ করে না তেড়েও আসে না ।ওরা বুঝতে পেরেছে বিকাশের করুণ অবস্থার কথা। মেয়েকে গাছ তলায় শুইয়ে দিয়ে এদিক ওদিক করতে করতে বিকাশ

একটা রিকশা পায়। নিকটবর্তী সরকারী হাসপাতলে বিকাশ মেয়েকে নিয়ে পৌঁছে যায় তড়িঘড়ি। হাসপাতাল কতৃপক্ষ ওকে দেখে অদ্ভুত আচরণে তাদের বিরক্তি প্রকাশ করে। যেন হঠাৎ করে অচ্ছুৎ কোন মানুষ হাজির হয়েছে তাদের সংসারে। বেশ সুখে, পরিপাটি ছিলেন তারা হাসপাতলে, কোথাও কোনো রোগীর চিহ্নমাত্র ছিল না।বেশ নিশ্চিন্তেই ডাক্তার ,নার্স ,স্বাস্থ্যকর্মীরা বহন করছিলেন খুশির মেজাজ, ছুটিরও বলা চলে। কোত্থেকে দুই আপদ জ্বরজ্বালা জর্জরিত মেয়েকে নিয়ে এসে হাজির হল ওদের কাছে। ডাক্তারবাবু ঘুম ভেঙ্গে এসে দেখলেন রোগীকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে রেফার করে দিলেন ওই সংস্থারই অন্য হাসপাতাল শিয়ালদাতে ।হতবাক বিকাশ প্রস্তরবৎ হয়ে যায়।আবারো একবার ফোন যায় ওর তপনদার কাছে ।'দাদা আমাকে শিয়ালদহ পাঠিয়ে দিয়েছে আমি এখন কি করবো?' উত্তর দিতে পারে না তপন প্রাথমিক ভাবে, তারপর ভেবে বলে 'আচ্ছা তুমি নিয়ে যাও মেয়েকে।' ডিপার্টমেন্টের অ্যাম্বুলেন্স নিতে ভুলনা।' চলল বিকাশ সরকারী অ্যাম্বুলেন্স চড়ে শিয়ালদার হাসপাতালে মেয়েকে ভর্তি করতে।

পরিচ্ছেদ-৩

রামা আর জীবন দুই ভাই। জীবন চাকরি করে আর রামার বিরাট মুদির দোকান ,ওরা জাতে মাড়োয়ারি। করোনার হাওয়ায় রামার দোকানে ভিড় উপচে পড়ছে আর জীবনের অফিস বন্ধ, জীবন তাই দাদার দোকানে ভিড় সামলাতে হাল ধরেছে। প্রাণ খুলে পয়সা উপার্জন করছে রামাজীবন।দোকানে প্রচুর মালের যোগান রয়েছে ।ওদিকে গণ্ডী কেটে দিয়েছে পুলিশ, দোকানে এসে,কে কোথায় দাঁড়াবে তার সরকারী নির্দেশিকা মানাতে। সঙ্গে ঘোষণা চলেছে এক সাথে ঘুরবেন না, একসাথে থাকবেন না আরও কত কি,কে শোনে কার কথা? গাদাগাদি করে মানুষ দোকান থেকে মাল তুলছে,মাসকাবারি লিস্ট নয় যেন জীবন কাবারি বাজার। লক্ষণগণ্ডি হুজুগে মানুষকে একটু হলেও থমকে দিয়েছে। গাদাগাদি চলে গেলে কোথায় যেন দোকানদারের মানসিকতায় আঘাত লাগে।মানুষ নিজেকে বড্ড এসেন্সিয়াল ভাবতে ভালোবাসে। দোকানের গাদাগাদি রামার ভালই লাগত নিজেরা নিরাপদ দুরত্বে থাকায়। অথচ বাড়িতে গিয়েই সেই একই মানুষ মিশতে দিতে চাইতো না ছেলেমেয়েদের ফ্ল্যাটবাড়ির অন্য মানুষের সঙ্গে।শিশুরা মনোবিদদের মত ,অনেক কিছু বুঝতে পারে ওরা। তাদের মনে সংশয় হয় যখন দেখে ফ্ল্যাটের ওপর থেকে বাপকাকার দোকানে হাজারো লোকের ভিড় অথচ বাপ ছেলেমেয়েকে মিশতে দিচ্ছে না অন্যের সাথে। ছেলেমেয়েরা বিদ্রোহ করতে থাকে তারা চায় বাপ-মাকে বাধ্য করতে নিজেদের মুক্তির জন্য ।শিশুরা মাঠে, ঘাটে খেলতে চাওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া, কেউ নেই শিশুমনের কড়া নাড়ার উত্তর করতে। টেলিভিশনে ক্রিকেট নেই ,ফুটবল নেই ,কার্টুন সবই পুরনো দেখা হয়েগেছে অতীতে বারবার। পাশের বাড়ির ফ্ল্যাটে, সমানে সমানে চারতলায় থাকে গুড্ডুরা। জানলা দিয়ে রামার ছেলে প্রেম আর গুড্ডু চোখে চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকে,গুড্ডু প্রেমের স্বজাতি। মাঝে মাঝে দুজনেই আকাশ দেখার চেষ্টা করে কিন্তু আকাশ জানলার ফ্রেমে বন্দী, বড়ই ছোট্ট ,ছোট্ট নীলাকাশ তাদের ডাকতে চায় কিন্তু পারে না। প্রেম গুড্ডু কে চেঁচিয়ে বলে 'এই গুড্ডু ছাদে যাবি?' গুড্ডু বলে 'কি করে যাব বাবা তো আমাকে তালা দিয়ে আটকে রেখেছে?' 'তোর মা, তোর মা কোথায়?' প্রেম জিগেস করে। গুড্ডু জবাব দেয় 'মাকেও আমার সাথে তালা দিয়ে আটকে রেখেছে।' প্রেম বলে 'কাকিমা কে কেন আটকে রেখেছে?'গুড্ডু বলে, 'সে তো জানিনা মনে হয় আমার জন্যই আটকে রেখেছে আমি যাতে কোথাও বেরোতে না পারি।' প্রেম জিজ্ঞেস করে 'আমার বাবা তো দোকানে বেচাকেনায় ব্যাস্ত, তোর বাবা কোথায় যায়?' গুড্ডু বলে

‘আড্ডা মারতে, একসঙ্গে দলবেঁধে আড্ডা মারছে ওরা।’প্রেম বলে ‘তাহলে আমরা কেন আড্ডা মারতে পারবো না? আড্ডা কি শুধু আমার বাবার দোকানের মাল যে যাকে তাকে বেচে দেবে, আর আমরা চাইলে আড্ডা কিনতে পারব না শুধু বড়োরা পারবে।’ গুড্ডু হেঁসে বলে ‘ধুস, আড্ডা কি কেনা যায়, শোন আমরা দুজনেই না ঠিক তক্কে তক্কে থাকবো, সুযোগ পেলেই দুজনে নীল আকাশ দেখব ছাদে গিয়ে।’ এমন সময় গুড্ডুর মা এসে হাজির হয় বলে ‘কি করছিস?’ গুড্ডু বলে ‘গল্প করছি।’ মা গুড্ডু আর জানলার ফাঁক দিয়ে প্রেমকে জানলায় বসে থাকতে দেখে। মায়ের আশঙ্কা হয় প্রেমের সঙ্গে যদি আবার কোন ফন্দি আঁটে গুড্ডু। বলে চল,ঘরে চল অনেক পড়া বাকি আছে।’একটু শক্ত হয়ে গরাদ আঁকড়ে বসে থাকে গুড্ডু কিছুতেই যেতে চায়না। মা হঠাৎ করে হ্যাঁচকা টান দেয় হাত ধরে,পড়ে যাওয়ার সময় গুড্ডু বাঁ হাতটা উঁচিয়ে ইঙ্গিত করে প্রেমকে, আমি আসছি। একা প্রেম এখন শুধুই জানলার দিকে তাকিয়ে যদিও জানলা মানে এখন নিঝুম অন্ধকার।

পরিচ্ছেদ-৪

তপন একদিন সকালবেলা বাবাকে দেখে হাসপাতাল থেকে ফিরছে, হঠাৎ সে দেখে লাইন দিয়ে মানুষ জিটি রোড ধরে হেঁটে চলেছে।পিঠে কাঁধে ব্যাগ মাথায় গামছা। একজনকে অতিরিক্ত উৎসাহে জিজ্ঞেস করে বসে ‘আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?’ ওদের মধ্যে একজন জানান ‘আমরা রাজস্থান থেকে আসা অভিবাসী শ্রমিক, কাজ হারিয়ে ঘরে চলেছি।কোথায় থাকেন আপনারা?’ এর উত্তরে ওরা বলে ‘রাজস্থান আমাদের দেহাত।’সরাসরি বাংলা ভাষায় উত্তর করেছিলেন সেই শ্রমিক সন্তান,বিশ্বাস করতে পারেনি তপন। কারন ওর ধারনা নেই অভিবাসী কেউ এমন স্পষ্ট উচ্চারনে বাংলা বলতে পারে। আরেকটু এগিয়ে দেখে আবার একদল শ্রমিক। একই প্রশ্ন করে সে, একজন তাদের মধ্যে থেকে বলে ওঠে- আমরা রাজস্থান যাচ্ছি ।তপন বলে ‘এই গরমে কি করে সম্ভব হেঁটে হেঁটে রাজস্থান যাওয়া?’ ওনারা জানান যদি রাস্তায় কোথাও কোনো লরি পাওয়া যায় তাহলে ওরা একযোগে সবাই চলে যাবে। ভোট বাগানের একটা অভিজ্ঞতা তপনের জানা আছে গতকাল ভোট বাগানের এক হাজার শ্রমিক এইভাবে লরিতে চেপে যাত্রা করেছিল অজানার উদ্দেশ্যে। বাড়িতে এসে তপন টিভি খুলে দেখে ঘোষিত হয়েছে শুধু আন্ত রাজ্যে নয়, রাজ্যের জেলায় জেলায় ব্যারিকেড,লকডাউন। তপন ভাবতে থাকে এই শ্রমিকদের কথা কিভাবে এরা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, কি খাবে, কোথায় থাকবে? এই ভাবনা গুলো কিলবিল করতে থাকে তপনের মনে। সে খুঁজে বেড়ায় কোন একটা পথ যাতে অন্তত কিছু শ্রমিককে খাওয়ার ব্যবস্থা সে বা তারা করতে পারে। যোগাযোগ করার চেষ্টা চালু হয় গ্রামবাংলায় তার অনেক সমাজকর্মী বন্ধুবান্ধব এর সাথে।যেখান থেকে কম পয়সায় ট্রাকে করে খাদ্য সামগ্রী, আনাজ আনার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে থাকে তপন। যোগাযোগ করতে থাকে কলকাতার অনেক ছোট ছোট গ্রুপের দামাল ছেলেদের সঙ্গে যারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষের জন্য খাদ্যসামগ্রীর যোগান দিতে ,অসুস্থ মানুষের কাছে ওষুধ,রক্ত পৌঁছে দিতে। ওদের সঙ্গে তপনের পুরনো যোগাযোগ ছিল, ওদের দেখেই তপনের আবার যৌবন ফিরে চাওয়া। তপন ওদের কাছে বলে নিজের ভাবনার কথা। কিভাবে গ্রাম থেকে খাদ্য সামগ্রী এনে কাজের জায়গাগুলো তে আনাজ খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া যায়। বিভিন্ন সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সে সুষম বন্টন করতে চায় খাদ্যসামগ্রী। পয়সা কোথা থেকে আসবে? সাধারণ বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সবার কাছে তপন তার প্রস্তাবের কথা জানায় বহু মানুষ সহমত হয় , সাড়াও দেয়।সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যে জানান দেয় নিজেদের ইচ্ছেগুলো।তপন বুঝতে পারে অনেকেই ইচ্ছেগুলো নাড়াচাড়া করছিলো অথচ নেতৃত্ব দিতে পারেনি সাহসী

পদক্ষেপে।তপন ছোটবেলা থেকেই গান গাইতে খুব ভালোবাসতো যদিও সবার কাছে সে গান পৌঁছত না। মনের অন্তস্থল থেকে উঠে আসা গান, নিজের মনেই থেকে যেত। তপন কোন কিছু ভাবনা শুরু করার মুহূর্ত থেকে তপনের মনে পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী গান গুঞ্জরিত হয়। গানের রেশ ধরে ভাবনা কর্মে পরিনত হয়। অভিবাসী শ্রমিকদের মিছিল ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছিল, তপন ফাঁকা রাস্তায় আবেগ মথিত কন্ঠে চীৎকার করে গাইছিল 'সাড়া দাও সাড়া দাও সাড়া দাও উদাসীন থেকো না সাড়া দাও।' মানুষ তপনের ডাকে সাড়া দিয়েছিল অনেক মানুষ। এক অদ্ভুত স্বভাব তপনের সে যখন নিজে কোন ভাবনার মধ্যে ডুবে যায় তখন সারা পৃথিবী পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে সরে যায় তার মনজঙ্গল থেকে। মনে হয় ভাবনাগুলো খেলা করে মন-শরীরের আনাচে কানাচে। দৈহিক বিভঙ্গ দিয়ে সে নিজেকে বোঝায় শরীর কতটা প্রয়োজনীয় ভাবনার আগুনে হাওয়া দিতে।

যেদিন তপনের বাবার অপারেশনের দিন ঠিক হয়েছিলো ঠিক তার আগের দিন থেকেই লকডাউন চালু হয়ে গেছিল।বিকাশ মেয়ে অনিতা কে ঠিক আগের দিন শিয়ালদহ সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করেছিল। বিকাশ বাধ্য হয়েছিলো হাসপাতালে থেকে যেতে, বাড়ি ফেরার তার কোনো উপায় ছিল না। সকালবেলা ডাক্তারবাবু বিকাশকে ডেকে বলেন 'লিলুয়া হাসপাতালের কি খেয়ে দেয়ে কোন কাজ নেই এত সাধারণ কেস রেফার করে দিল। আমরা এই পেশেন্ট রাখতে পারব না আপনি ওকে নিয়ে বাড়ি চলে যান।' বিকাশ কাঁদো কাঁদো সুরে বলে 'এই সময় বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়, আপনারা যদি আর কয়েক দিন রেখে দেন বা এ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা করেন তবেই মেয়েকে নিয়ে যেতে পারি।'কোন কথা না শুনে ডাক্তারবাবু ডিসচার্জ লিখে দেন। শ্মশানের মতো শুনশান রাস্তাঘাট, স্টেশন চত্তর,একটা লেডি কুত্তারও দেখা মেলা ভার। অসহায় বিকাশ, কন্যাকে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে থাকে। এমন সময় বাবার অপারেশন এর ফল জানতে উদগ্রীব তপনের কাছে বিকাশের ফোন আসে। তপন জানতে পারে ঘটনা পরম্পরা। কল্পনার দৌড়ে পৌঁছে যায় শিয়ালদায়, বিকাশের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে চিন্তা করতে থাকে আর ছুটতে থাকে মাথার মধ্যে চঞ্চল রক্তস্রোত যা হয়ত পথ দেখাবে বিকাশের আশু কর্তব্য কে। তপনের কথায় রাজি হয়ে বেলুড় অঞ্চলের এক দরদী অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার বিকাশ কে আনতে যায়। যার সহায়তায় বিকাশ মেয়েকে নিয়ে ঘরে ফিরতে পারে। তপনের বাবার অপারেশন ঠিকঠাক হয়েছে ডাক্তার তপন কে ডেকে পাঠায় বাপের সঙ্গে কথা বলার জন্য। বাবা জানিয়ে দেন তিনি ঠিকঠাক আছেন কোন চিন্তা নেই।

পরিচ্ছেদ-৫

তপন জানে তার বাবা পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার এ থাকবে, বিকেলে আজ সে আর বাবাকে দেখতে পাবেনা। সে ঠিক করে গৃহকর্ম গুলো সেরে ফেলবে তারাতাড়ি এই ফাঁকে।বাজার দোকান সবই পড়ে আছে, তপন এমনি ভাবে ও ছাড়া সব অচল। বাড়ির সবাই নিশ্চিন্ত হয় জেনে যে বাড়ির লোক ভালই আছে। দুপুরে একটু রেস্ট নেবে ভেবে শুয়ে পড়ে তপন। কিন্তু ওর ভাগ্যে অবসর যাপন নির্দিষ্ট থাকে না কোনদিনই। বাড়ির লোক সদা সর্বদা ওর উপর বিরক্ত হয় এই কারণে। সাধ করে যে, বোঝা নেয়, তার বোঝা কে

বইবে? বাড়ির লোক তাই তপনকে খরচা খাতাতেই ধরে রেখেছে। বাজার দোকান সব ভাইকেই করতে হয়।বিশেষ বিশেষ কিছু দোকানির সঙ্গে তপনের সম্পর্ক ভালো আড্ডা মারার কারনে , সেখানে কেনাকাটা শুধু তপনের দায়িত্ব ।আবার একঘেয়ে বিরক্তিকর ফোনে টানা ব্যস্ত থাকে তপন, স্ত্রী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে 'তোমার বাড়ি আসার কি দরকার ছিল?' উত্তর করে না তপন কারণ উত্তর করলেই ঝগড়াঝাঁটি বাঁধবে। এর চেয়ে চুপটি করে ঘাপটি মেরে কাজ করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের। মেতে যায় সে চাল ,আলু, আনাজ গ্রাম থেকে কম দামে আনার প্রচেষ্টায় ।ঠিক করে কিভাবে পরপর, কোন রুট দিয়ে গাড়ি আসবে এবং কোন কোন লঙ্গরখানায় মাল নামবে ।পরিকল্পনার হাল হকিকত নিয়ে প্রত্যেকটি লঙ্গরখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষজনের সঙ্গে কথা ফাইনাল করে শুনশান রাস্তায় বাজারের পথে বেরিয়ে পড়ে সে ।

রাস্তার দু'ধারে ফ্ল্যাট। রাস্তার দূরত্ব খুব বেশি নয় তাই বড় গাড়ি চলাচল করে না। কখনো কেউ ভুল করে ঢুকে পড়লে বাঁকের মুখে ফেঁসে যেতে হয়। কি করে যে প্রোমোটার এইরকম ফ্ল্যাট বাড়ি বানানোর পারমিশন পায় কে জানে? গায়ে গায়ে ঠেকে থাকা বস্তি যেন, সাহেবদের কালে বানানোর রেল কোম্পানির আউট হাউজের মতো অনেকটা। যদিও তাতে সুবিধা হয়েছে প্রেম আর গুড্ডুর। আজ গুড্ডুর মা তড়িবত করে চিকেন কষা বানাচ্ছে তাই গুড্ডুর দিকে খেয়ালই নেই ।বাপ পড়েপড়ে ঘুমাচ্ছে অন্য ঘরে। গুড্ডু এতক্ষন মটকা মেরে পড়ে ছিল নিজের বিছানায়। ছেলে নয়তো যেন সমুদ্রের লাল কাঁকড়া, মানুষের পদশব্দ শরীরে অনুভব করে যারা ঘুপঘাপ ডুব মারে বালির গর্তে ,গুড্ডু তেমন ই। গুড্ডু, মায়ের আসার আন্দাজ পেয়ে নাক ডাকতে শুরু করে।মা দেখে ছেলে ঘুমোচ্ছে, নিশ্চিন্তে ঘর ছেড়ে রান্না ঘরে চলে যায় ।মায়ের নিশ্চিন্ততা গুড্ডু কেও নিশ্চিন্ত করে । গুড্ডুর বাবা রিটায়ার্ড আর্মি ছিল ওদের ঘরে আমিষের অনায়াস প্রবেশাধিকার আছে। মা এখনো সম্পূর্ণ শুচিবায়ুগ্রস্থতা ছাড়তে পারেনি। রান্না ঘরে ঢুকলে কাজ সম্পন্ন করে স্নান সেরে তবেই ঘরে এসে ঢুকবে। অনেকটা সময় পেয়ে যায় গুড্ডু। একটা চিরকুট লিখে, লাটাই থেকে সুতো নিয়ে ঢিলে জড়িয়ে বাঁধে।হাত বার করে জোরে ঢিলটা ছুঁড়ে দেয় প্রেমের জানলার দিকে। বেশ কয়েকবার ব্যর্থ হবার পর প্রেম বলে 'কি লিখেছিস মুখে বল না।' গুড্ডু বলে 'সে অনেক কথা মুখে বলা যাবে না।' প্রেম বলে দাঁড়া 'একটা লাঠি নিয়ে আসি তারপর হবে।'শেষমেষ বাড়ানো লাঠিতে জড়িয়ে যায় গুড্ডুর ঢিল ।গুড্ডু হাততালি দিয়ে ওঠে। প্রেম তাড়াতাড়ি ঢিল থেকে চিরকুটটা ছাড়িয়ে বারবার পড়ে দেখতে থাকে। অবাক হয়ে সে ফ্লাইং ম্যান কার্টুনের দুটি ছবি আবিষ্কার করে সেখানে। বহুবার প্রেম ফ্লাইং ম্যান কার্টুন দেখেছে। সে বুঝতে পারেনা গুড্ডুর ফ্লাইং ম্যান এর ছবি দেওয়ার কারণ। তখনই ছবির ভাঁজের ভেতর থেকে আর একটা চিরকুট বেরিয়ে পড়ে। চকিতে প্রেম চিঠিটা পড়ে ফেলে। তারপর ছুটে গিয়ে মায়ের মোবাইলটা নিয়ে আসে। প্রেম জানে মায়ের মোবাইলের লক কিভাবে খুলতে হয়। ছোটবেলার পড়া কিভাবে কার্টুনে পরিণত হয়েছে প্রেম আর একবার ভালো করে দেখে নেয়, দেখে নেয় ফ্লাইং মানের পরিধেয়। ওদিকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে গুড্ডু জানলায়। প্রেম জানলায় এলে গুড্ডু জিজ্ঞেস করে 'কিরে হবে?' প্রেম মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে, সে আরও বলে 'মা আর দিদির হলদে সবুজ ওড়নার কাপড় আছে তার থেকে কেটে বানিয়ে ফেলব ড্রেস। গুড্ডু বলে 'কিন্তু পাঠাবি কি করে?' প্রেম বলে 'আমি উড়ে যাব তোকে নিয়ে।' গুড্ডু বলে 'না, ওটা আমার প্ল্যান আমি ফ্লাইং ম্যান।' মন-কষাকষি চলতেই থাকে এই নিয়ে ।প্রেম বলে 'তাহলে ড্রেসটাও তুই ডিজাইন কর।' গুড্ডুর শেষমেষ জানায় অক্ষমতা। বেলা প্রায় পাঁচটা ,গুড্ডু দরজার ছিটকিনি

খুলে ছাদে পৌঁছে যায় বিড়ালের মত। বাপের ঘুম ভাঙার মুখে আজ ,তেমন আড্ডা জমে নি তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছিল সে। খুট করে ছিটকিনি খোলার শব্দ পেয়ে বাপ উঠে পড়ে আড়মোড়া ভেঙে, দেখে নেয় চোখ চালিয়ে চারিপাশ।রান্নাঘর থেকে খুটখাট শব্দ ভেসে আসতে থাকে ।আজ রাতে চিকেন কষা রুটি মনে পড়ে যায় মনোজের, মনোজ গুড্ডুর বাবার নাম। গুড্ডুর বাবা খুব পেটুক, বিছানায় শুয়েই ডিনারে মুরগির ঠ্যাং চিবানো তৃপ্তির কথা ভাবতে থাকে সে। তারপর বারকয়েক হাই তুলে উঠে পড়ে, রান্নাঘরের দিকে গিয়ে বউকে চমকে দেওয়ার চেষ্টা করে। বউ ভাবেনি মনোজ এত তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়বে। সে বলে 'কিগো, গুড্ডু কে ঘুম থেকে তুলে পড়তে বসাও।' এই এক বিরক্তিকর কাজ কিন্তু বউয়ের অর্ডার মানতেই হবে। সে হেলেদুলে গুড্ডুর ঘরে গিয়ে দেখে বিছানা ফাঁকা। হঠাৎ ছিটকিনি খোলার শব্দর কথা মনে পড়ে যায় মনোজের, দৌড়ে এসে রান্নাঘরে ঢোকে সে, বউকে জানায় 'গুড্ডু নেই!' হাউমাউ করে রান্না ফেলে বউ বেরিয়ে আসে। স্বামী-স্ত্রী ঘর খুলে গুড্ডুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে ।কোন দিকে যাবে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। স্ত্রী বলে 'ফ্লাটের কোলাপসিবল গেট লক করা গুড্ডু বাইরে যেতে পারবে না।'দুজনে তখন পড়িকিমড়ি করে ছাদে উঠতে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দু'পাশে ছাদ, দুজনে দু দিকে চলে যায় ।বাপের চোখে পড়ে গুড্ডু জলের ট্যাংকের ওপর দাঁড়িয়ে ইঙ্গিত করছে কাউকে। পাশের ছাদের চিলেকোঠায়, প্রেম, অদ্ভুতুড়ে পোশাক পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ততক্ষণে গুড্ডুর মা হাজির হয়েছে বাপের পাশে। বাপ, মা কে ইঙ্গিত করে চুপ করতে বলে। গুড্ডু চিৎকার করে কবিতা আবৃত্তি করে চলেছে। ক্লাস ওয়ানের শেখা ছোটবেলার কবিতা 'ফ্লাইংম্যান।'

'Flying man Flying man can't you take me?'

সন্তর্পনে মনোজ ততক্ষণে হাজির হয়েছে ঠিক ট্যাংকের নিচে, গুড্ডুর অগোচরে। ছন্দের মধ্যে থাকায় গুড্ডু টের পায়নি একটুও।পাইপের উপরে পা দিয়ে মনোজ নাগাল পেয়ে যায় গুড্ডু শরীরের, জাপটে ধরে গুড্ডু কে? গুড্ডু চিৎকার করতে থাকে 'প্রেম আমায় নিয়ে যা, আমাকে ফেলে তুই নীল পাহাড়ের দেশে যাস না, প্রেম। এখানে শুধুই বাবা-মায়ের চোখরাঙানি আর শাসন।' ভয়ার্ত মা হাড়হিম করা অনুভবে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে। মনোজ বুঝতেই পারছে না কি করে ছেলেটার অস্থিরতা কাটিয়ে নামিয়ে আনবে ছাদে। অনন্ত সময় ধরে চলতে থাকে মুহূর্তগুলো। মনোজ শরীরের সমস্ত কাঠিন্য, শক্তি দিয়ে জাপটে ধরে থাকে গুড্ডু কে, নড়তে পারে না গুড্ডু।

পরিচ্ছেদ- ৬

শিয়ালদা হাসপাতাল ফেরত অনিতার দুপুরটা ভালই কাটে। একটু ঘুমিয়ে নিয়ে চাঙ্গা হয়ে বিহারে ওর ভালবাসার মানুষ দাদির সাথে কথা বলতে চায় সে।বিকাশ চাইতো না নিজের মায়ের প্রিয় নাতনির শারীরিক অবস্থার কথা মা জানুক। বিকাশ তখন রাতে তপনের বাড়ি এসেছে ।মেয়ের গল্প শেষ করে একটা ওষুধের সন্ধান চায়। হাসপাতাল উক্ত ওষুধ না দিতে পেরে কিনে নিতে বলেছে। খোঁজখবর করে একটা ন্যায্য মূল্যের দোকান এ ওষুধটা পাওয়া যায়। প্রথম ডোজ পড়ে গেলে অনিতা কে একটু ঝরঝরে লাগে। কখন যে বিকাশ মেয়ের পাশে জেগে বসে থাকতে থাকতে শরীর এলিয়ে ফেলেছে নিজেই তা জানে না। শর্মা ছোটবেলা থেকেই খুব ভলি খেলার ভক্ত ছিল। খেলতে যে খুব ভালো পারত এমন নয় কিন্তু মাঠ ওর জীবন ছিল। পাশাপাশি দুটো টিম খেলে দুটি কোর্ট ।একটায় শর্মার মত ফালতুরা অন্যটায় রেল পুলিশের জওয়ানদের খেলা। মাঝেমধ্যে নিজেদের খেলার

অবসরে বিকাশ অন্য কোর্টে তাকিয়ে দেখতো কেমন হিংস্র হয়ে জওয়ানরা নেটের উপর দিয়ে চাপ মারছে। বিকাশ আন্ডার আর্ম ছাড়া কিছুই পারে না, দু একবার লিফটিং করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এমন চোট লেগেছিল আঙুলে ও পথ আর মাড়ায়নি কক্ষনো, কোন কালে।ঘুমের অচেতনে, সেই শৈশবের কর্নেল মাঠ ভেসে আসে স্বপ্নের মধ্যে। প্রতিদ্বন্দী বদল হয়ে গেছে সেখানে, মাঠের দুই প্রতিপক্ষের এক পক্ষে ফালতুরা অন্য পক্ষে হিংস্র জওয়ানেরা। বিকাশ আজ দর্শক, উৎসাহ নিয়ে খৈনি টিপছে মাঠে। হুইসেল দিয়ে খেলা শুরু ,কী আশ্চর্য ফালতুরা সেদিন প্রথম গেমটা জিতে নিল সহজেই। কোর্ট চেঞ্জের সময় জওয়ানেরা হেরে গিয়ে খুব খুব মুখ খিস্তি করছে, বিকাশের খুব মজা লাগছে। খুব মন দিয়ে সে বলের গতিবিধি লক্ষ্য করছে, হঠাৎই বলটা ওর চোখ থেকে সরে যায়।প্রতিপক্ষ দু দলও বদল হয়ে যায় নিজের অজান্তে। বিকাশ একটু চোখ কচলে নেয়,নাহ ঠিকই দেখছে সে। দুটি দলেরই পরনে জার্সির বদলে হান্ড গ্লভস,মাস্ক, আপ্রন,স্টেথেস্কোপ, শুধু রঙে ভিন্ন।আর বল কই এতো অনিতা!মেয়ের ক্লান্ত মুখচ্ছবি ভেসে উঠছে নেটের ওপরে, সামনে , পেছনে,কখনও বা কোর্টের বাইরে। ঘুমের ঘোরে বিকাশ বলতে চেষ্টা করে তোমরা বল নিয়ে খেলো ও তো আমার মেয়ে, অনিতা। খেলা চলতেই থাকে, ফালতুরা কোনরকমে আন্ডারআর্ম পাঠাচ্ছে, শতাধিক হিংস্রতায় জওয়ানরা ফেরত দিচ্ছে বল। বিকাশের পাশ দিয়ে একবার লাফাতে লাফাতে চলে গেল বল, প্রাণপণে হাত বাড়িয়েও সে নাগাল পেল না। ছুটে গিয়ে এক জওয়ান দখল নিল বলের। কখনো ভলি কখনো স্ম্যাশ। বিকাশ চেঁচিয়ে বলে ‘ও মরে যাবে,রেফারি বাঁশী বাজাও, খেল খতম কর ইয়ার।’ থামে না খেলা, স্বপ্নও না থেমে কলিজা ছিঁড়েখুঁড়ে বহমান বুকের গভীরে গিরিকন্দরে । ঘুমের ঘোরে বিকাশ দুহাত তুলে খেলা থামাতে চেষ্টা করছে। হঠাৎ সাড়ে ছয় ফুট এক জওয়ান মাঠ থেকে তিন ফুট লাফ দিয়ে নেটের উপরে উঠে প্রচন্ড এক স্মাশ করে, বলটা খুঁজে পাওয়া যায় না আর মাঠের কোনখানে। উপস্থিত সবাই এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে বলটা। বিকাশ লাফ দিয়ে উঠেপড়ে বিছানা ছেড়ে ,গলা শুকিয়ে কাঠ, পেচ্ছাপ করে ফেলেছে সে বিছানায়। সেই অবস্থায় সে অনিতা কে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে অঝোরে, ঘুমের আচ্ছন্নতায় কেউ তা টের পায়না।

ভোর হবার সাথে সাথেই মেয়ের ঘুমের ওষুধের জের কেটে যায়, মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে অনিতা।আবারও একই কিস্সা লিলুয়া হাসপাতাল ভর্তি নেয়। তপনবাবুর যুক্তির ভারে নত হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এবার একটা অন্য তরিকা লাগায় ডাক্তারবাবুরা বিকাশের কাছে জানতে চায় সে কি কখনো এই সময়ে বাইরে কোথাও গেছিল?বিকাশ পুনে থেকে ফেরার পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অর্ডারে এই হাসপাতালে ফিট সার্টিফিকেট নিতে এসেছিল, সেই কাগজ দেখায় ডাক্তারবাবুকে। সেখানে লেখা ‘Vikas is fit to resume duty’.গভীর মনোযোগ দিয়ে ডাক্তারবাবু সার্টিফিকেট দেখেন। আর তার থেকে নির্যাস হিসেবে বেছে নেন পুনে যাওয়ার কিসসাকে, প্রমানপত্রের নির্দেশিকা বাদ দিয়ে। এরপরই অদ্ভুত আচরণ করতে থাকেন ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থকর্মীরা,। বিকাশ জীবনে এমন অপদস্ত হয়নি কখনো, নিজেকে সে নরকের কিট ভাবতে থাকে। কোন রকম টেস্ট ছাড়াই ডাক্তারবাবুরা জানান দেন যে আপনার নিশ্চয়ই করোনা হয়েছে। আবার নিজেদের সুবিধার্থে ওনারা চেপে যান এই গল্পের কথা।চুপচাপ বিকাশের স্বপ্নের আন্ডারআর্ম খেলে মেয়েকে আবার পাঠিয়ে দেয় অন্য কোর্টে, মানে শিয়ালদহ হাসপাতলে, দিনটা ছিল 28 শে মার্চ।

থলি হাতে বাজারের দিকে বেরিয়ে তপন নিজের মনেই হাটছিল। এই ওর বড় দোষ মাঝেমধ্যে হারিয়ে যাওয়া। দুপুরবেলা কুকুরগুলো ভ্যাটের চারধারে ঘুরঘুর করে খাবারের সন্ধানে। কুকুর মানুষের গা ঘেঁষে থাকতে খুব ভালোবাসে তাই এখন কুকুরেরও অসময।ভ্যাটে তেমন খাবার পড়ছে না। প্রকৃতির জীব যারা, তারা দিব্যি উপভোগ করছে মানবজাতির এমন নির্বাসন।বাঁ দিকে মোড় ঘুরতেই কুকুর গুলোর কামড়াকামড়ি, চীৎকার ওর নিমগ্নতা খানখান করে দেয়।সামনে তাকিয়ে তপনের চিত্তি চড়কগাছ।পাড়ার সবকটা কুকুর ভুরিভোজ দিচ্ছে ,কামড়াকামড়ি করছে নিজেদের মধ্যে খাবারের বড় অংশ ছিনিয়ে আনার জন্য। পাশে বাচ্চাগুলো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে অপেক্ষায়, মা কখন তাদের জন্য খাবার আনবে ।ভালো করে কুকুরের জটলার মধ্যে তাকিয়ে তপন দেখতে পায় কুত্তাগুলো দুখানা বিড়াল মেরে ভুরিভোজ দিচ্ছে । কেমন গা ঘিনঘিন করে ওঠে ওর ।মুহূর্তে লকডাউন ভাঙলে সমাজের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে তপনের মন ক্যামেরায়। হয়তো নিজেদের মধ্যে এমনই কামড়াকামড়ি চলবে। কিন্তু আর ভাবতে পারে না সে কারণ রামার ফোন এসে কেটে গেছে । সে ত্রস্ত পায়ে রামার দোকানের দিকে এগিয়ে যায়। দূর থেকে দেখে এক বিশাল জটলা ।রামার ফোন আবার আসে, ততক্ষণে চোখাচোখি হয়ে গেছে ওদের। রামা চিৎকার করে বলে 'দাদা তাড়াতাড়ি এসো.....।' চেঁচামিচির মাঝে কিছুই আর কর্ণ গোচর হয় না তপনের। জটলা ঠেলে ঢোকার আগে তপন দেখে চারপাশে ফ্লাটের বারান্দায়, জানলায় লোকের উৎসুক মুখ। চারতলার জানলার গরাদ ধরে কে একজন মাথা ঠুকছে, ভাল করে দেখে সে বুঝতে পারে এ রামার মা।তপন কে দেখে ভদ্রমহিলা চেঁচিয়ে বলে 'বেটা মেরেকো লে যাও,হাম যায়েঙ্গে, আকেলা উসকো হাম কহিঁ নেই ছোড় শেখতা।'ফাঁক দিয়ে দেখে কিম্ভূতকিমাকায় পরিচ্ছদে, কেপ পরিহিত রক্তাক্ত এক বালক পড়ে আছে মাটিতে। তপন কথা না বাড়িয়ে একটা ভয়েস মেসেজ পাঠায় 'ক্যাপ্টেনস টিমের' উদ্দেশ্যে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসে ভয়েস মেসেজে 'দাদা আমরা আছি,রেডি করছি সবকিছু, তোমরা পৌঁছাও তাড়াতাড়ি এবিসি এইচ হাসপাতালে।'তপন নিজে যেতে অপারগ জানায় রামা কে। গাড়ি ছুটতে থাকে গাড়িতে সওয়ার হয় মনোজ, গুড্ডুর বাবা। কারণ গুড্ডু বলেছে বাপকে 'যদি তুমি প্রেমকে ফিরিয়ে না আনতে পারো তাহলে আমিও হারিয়ে যাব।'

আজ একত্রিশ মার্চ সকাল, তপন বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাসপাতলে বাবাকে দেখে যাবে ক্যাপ্টেনদের ঠেকে, সেখানে স্যানিটাইজার বানানো হবে। যা অদূরে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল গুলোর স্বাস্থ্যকর্মীদের দিতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীরা একেবারে নিধিরাম সর্দারের লড়াই লড়ছে। বাপ ভেন্টিলেশন থেকে বেরিয়ে এসেছে, তপনের মুড একটু ভালো এখন চলছে কাজ ওদের ইচ্ছে ১০০ লিটার মাল বানিয়ে রাখা। কিন্তু বিধিবাম, তপনের এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল,সে যা ভাবতো যেভাবে ভাবতো, সেই মতো চলতো ঘটনাপ্রবাহ যেন সবকিছু সে আগেভাগে ঠিক করে রেখেছে। এই অসময় নড়িয়ে দিয়েছে ওর বিশ্বাসের ভিত। এতোকাল ওর বন্ধু আত্মীয় সবাই তপনের নিদান জানতে চাইত যে কোন বিষয়ে। তপনের কেমন নিজের প্রতি সেই জোর টা আর নেই। এর মূল কারণ বিকাশ, সে এখনই ফোন করে বলল 'ডাক্তার জোর করে, ভয় দেখিয়ে তার কাছে জেনে নিল পুনে যাওয়ার ইতিবৃত্ত।' তপন বলে 'তাতে কি, তুমি বলনি যে তুমি কুড়ি মার্চে ফিরেছো, মেয়ের অসুখ চোদ্দ মার্চ থেকে।' বিকাশ বলে 'দাদা, আমি সব বলেছি, ওরা আমাকে বলল তুমি হাসপাতালে ত্রিসীমানায় আসবে না। যতক্ষণ না বেলেঘাটা আইডি তোমাকে করোনা নেগেটিভ ঘোষণা করছে। এখন আমি কি করব বলে দিন।' বড়ই হতাশ লাগে তপনের।অনিতার জন্য সে প্রায় কিছুই করতে পারছে না। যাহোক হাতে হাতে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে

এসে বিকাশ কে ফের ফোন করে -তুমি বাড়ি চলে এসো বিকাশ। ততক্ষণে ঠাঠা রোদ্দুরে বেলেঘাটা আইডির পথ হাঁটছে বিকাশ।বিকাশ হাওড়ায় বহুদিন থাকলেও কলকাতার অলিগলি চেনে না একদম। মাঝেমধ্যে ফোন করে জিজ্ঞেস করে নেয় তপন কে।মিনিট চল্লিশের এর ত্রস্ত হন্টন তাকে পৌঁছে দেয় আইডি হাসপাতলে। বেশ কিছুক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে কাউন্টারে পৌঁছায় বিকাশ। ঠিক তখনই হসপিটাল ফোন করে জানায় বিকাশকে, 'আপনি কোথায়? আপনার মেয়ে অনিতা কে ভেন্টিলেশনে দিতে হবে।' বিকাশ জানায় 'আপনারাই তো আমাকে আইডি যেতে বললেন।'ফোন কেটে দেয় নার্স।অনিতা ভেন্টিলেশন সাপোর্টে বেঁচে আছে ,এই খবর জানার পর এলোমেলো তপন ভাবতে থাকে ইস এই ফুলের মত মেয়েটার ভেন্টিলেশনে না ঢুকে যদি ওর বৃদ্ধ বাবা ভেন্টিলেশনে থাকতো ।এমন অবান্তর ভাবনা কখনো তপনকে গ্রাস করেনি আগে, ছটফট করতে থাকে সে। আবারও ফোন আসে, ফোন আজ তপনের কাছে আতঙ্কের আরে এক নাম। এবার বিকাশ জানায় 'আইডি হাসপাতাল জানিয়ে দিয়েছে এই টেস্ট এখানে সম্ভব না আপনাকে আর জি কর যেতে হবে।' বিকাশ এত বছর বাংলায় থাকলেও নামই শোনেনি এই হাসপাতালে, মানুষকে জিজ্ঞেস করতে করতে একটা রিক্সা পায় শেষমেষ। রিক্সা চালক কিছুদূর গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে বলে 'হাম ঠগ গায়া, হামসে আউর নেহি হো গা।' নেমে পড়ে বিকাশ, ক্লান্ত পদক্ষেপে হাঁটা শুরু করে দেয়, ওকে যে থামতে নেই। যেভাবে হোক আজ নিজেকে প্রমাণ করে মেয়ের কাছে ফিরতে হবে। মনে ভাবে যদি করোনা পজেটিভ হয়? না, আর সে ভাবতে পারছে না, মেয়ের করুণ অবস্থার কথা ভেবে আবার জোর কদমে হাঁটা লাগিয়ে সে পৌঁছে যায়। সেখানে বিরাট লাইন, বিকাশ একবার ঘড়ি দেখে। কত সময় লাগবে তার একটা আন্দাজ পেতে চায় মনে মনে। লাইন খুব ধীরে এগচ্ছে। রাত এখন বড় হতে শুরু করেছে, আকাশে সূর্যি মামা দিগন্ত রেখার দিকে ঢলে পড়বে শিঘ্র। বিকাশ পৌঁছে যায় এক নম্বরে । এক গুঁফো স্বাস্থ্যকর্মী গম্ভীর হয়ে বলে 'টেস্ট এখন সম্ভব নয়,চোদ্দ দিন বাড়ি বসে থাকুন, যদি জ্বর হয় তবেই আসবেন টেস্ট করাতে। ঠিক সেই সময় হাসপাতাল থেকে আবারও ফোন আসে – একটা ১৬ মিলিমিটার ক্লোজড ক্যাথিটার লাগবে, সাক্সানের জন্য যা জরুরী।কিছু জিগেস করার আগেই ফোন কেটে দেয় নার্স। কি করবে ভেবে না পেয়ে বিকাশ ফোন করে ইমতিয়াজ কে বলে, 'একটু দেখত ১৬ মিমি পাইপ মেডিক্যাল কলেজের কাছে পাও কিনা, আমি whatsapp পাঠাচ্ছি। ওটা না পেলে আমার মেয়ে বাঁচবে না।' ওদিকে হঠাৎ ফোনের আগমনে বিরক্ত হন গুঁফো সম্রাট। তিনি বলেন 'লাইনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ান,দেখছেন না কত লোক লাইনে?' বিকাশ কেঁদে ফেলে বলে 'মেয়ের এখন তখন অবস্থা,আমাকে দয়া করে ফিট দিন নাহলে হাসপাতাল আমাকে মেয়ের কাছে যেতে দেবেনা।আজ একত্রিশ, আমি কুড়ি মার্চ ফিরেছি, প্রায় এগারো দিন কেটে গেছে।' গোঁফের ফাঁক দিয়ে হেঁসে ভদ্রলোক জানান 'ধুস, তাহলে তো হয়েই গেছে আর তো মোটে তিন দিন।' গরাদের ফাঁক দিয়ে ডাক্তারের সই করা নির্দেশিকা বিকাশের হাতে ধরিয়ে ভাগিয়ে দেয় বিকাশ কে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বিকাশ বুঝে উঠতে পারে না শিয়ালদার পথের দিশা। আসার সময় রিকশায় অলিগলি পেরিয়ে কিভাবে যে এসেছিল কিছুই মনে নেই তার। সে ভাবে শিয়ালদা গিয়েই বা কি হবে? চুপটি

করে দাঁড়িয়ে থাকে বেশ কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ইমতিয়াজের ফোনে তার ঘুম ভাঙ্গায়, ইমতিয়াজ জানায় ‘কোত্থাও ক্লোজড ক্যাথিটার নেই,সব ই ওপেন, মেডিক্যাল কলেজ চত্তর ছানবিন মেরে দেখেছি।’ বিকাশ ভাবে গোলি মারো শালে ক্যাথিটার কো।নিজের ভাবনা প্রকাশ করে ফেলে ফোনে ইমতিয়াজের কাছে ‘ইয়ার তু বাতা প্যাহেলে, তেরে ঘর মে মেরেকো জায়গা মিলেগা, স্রিফ এক রাত কে লিয়ে?’ ইমতিয়াজ বলে ‘তু চল পড়, মোলাকাত হোগা ঘরমে।’ এই বলে তার ঘরে পৌঁছানোর দিক নির্দেশ করে ইমতিয়াজ। দীর্ঘ কয়েক দিন হাসপাতালে পড়ে থাকা, উপবাস, চলার ক্লান্তি, প্রিয়তমা কন্যার জন্য উদ্বেগ সঙ্গে নিজের বেঁচে থাকার টানাপোড়েন বিকাশকে বোধহীন করে তুলছে? কখনো কখনো সে ভেবেছে অনিতার সঙ্গে সেও যদি চলে যায় তাহলে পরিবারের কি হবে? ইমতিয়াজ বাড়ি পৌঁছে বিকাশের উদ্বেগ আরো বেড়ে যায়। ছোট্ট একটি বস্তির ঘর যেখানে গাদাগাদি করে ছেলে, মেয়ে, মা,কাকিমা, বউ থাকে, কাকিমা আবার অসুস্থ। বিকাশ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ইমতিয়াজের দিকে ।এখানে তিল ধারণের জায়গা নেই বুঝতে পেরে বিকাশ বলে ‘তব তু মেরেকো কাহ্যে বোলা?’ইমতিয়াজ এই স্বাভাবিক রুস্টতায় রাগ করে না, ‘বলে আমি লছমন কে ফোন করে বলছি তোমাকে রাখার জন্য।’ বিকাশ বলে ‘আমি লছমনের ঘর চিনিনা।’ ইমতিয়াজ ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরোয় লছমনের বাড়ির উদ্দেশ্যে।আদর করে লছমন ঘরে নিয়ে যায় বিকাশ কে? ইমতয়াজ লছমনের ঘরে ঢোকে না কারণ ওরা গোঁড়া ব্রাহ্মণ। উপবাসী বিকাশকে লছমন বাড়িতে বানানো আলুর পরোটা আর চাটনি খেতে দেয় । বিকাশের খাওয়া দেখে বুঝতে পেরে লছমন গিন্নিকে আরও খান কতক দিতে বলে ।গোগ্রাসে খেয়ে ঢকঢক করে জল খায় বিকাশ, মনে হয় কয়েক জন্ম খায়নি সে। বাসন গুছিয়ে চা করতে যান লছমনের স্ত্রী। ঘরের দরজায় মৃদু খটখট শোনা যায়, প্রথমে খেয়াল করে না কেউ আওয়াজ বাড়তে থাকে। ছোট্ট একটা জমায়েতের শব্দ শোনা যায়। একটা কর্কশ স্বর হেঁকে ওঠে ‘লছমন ভাইয়া, খোলিয়ে দরওয়াজা।’লছমন দরজা খুলে দেখতে পায় ওর বন্ধু, আত্মীয়, পড়শীদের যাদের কাউকে এইরূপ বিভীষণ রণে দেখেনি কখনো সে। ভেতরে তখন রসনাতৃপ্ত বিকাশ হাঁফ ছেড়ে শ্বাস ছাড়ছে। বাইরে থেকে আসা মানুষজন দরজার বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছে বিকাশকে। হেঁড়ে গলা প্রশ্ন করে ‘লছমন ও কোন হ্যায়?’ভাইয়া কথাটাও আড়াল ও হারিয়েছে পড়শির মুখে আজ। খুব সাধারন গলায় লছমন বলে ‘দোস্ত, আজকে লিয়ে মেরে ঘর রানে মাংতা লড়কি হাসপাতাল মে হে।’ কর্কশ কন্ঠ, সঙ্গে আরও অনেকে কুৎসিত ভাষায় বলে ওঠে ‘ চুতিয়া, রহেনেকা জায়গা আভি মিলেগা তুঝে।’ দুর দার ঘরে ঢুকে পড়ে সবাই, দুহাত ধরে বিকাশকে হিড়হিড় করে বস্তির গলিতে নিয়ে আসে প্রথমে, তারপর টানতে টানতে বড় রাস্তার মুখে এনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পেছনে পেছনে ক্রন্দনরতা লছমন পাশে এসে দাঁড়ায়। ফ্যালফ্যাল করে দুজনে তাকিয়ে থাকে দুজনের দিকে পলকহীন।

কোন কথা না বলে বিকাশ টলমল করে হাঁটতে থাকে জনহীন রাস্তায়।অব্যক্ত যন্ত্রণা নিয়ে লছমন বিকাশের পিছু পিছু হাঁটতে থাকে।বিকাশ পেছনে তাকিয়ে লাচ্মান কে বলে ‘তু যা ইয়ার। মেরা আব কোই রাহা নেহি হে।’ গভীর রাত্রে মদ্যপ মানুষ যেভাবে পথ চলে বিকাশ সেই ভাবে এগিয়ে যেতে থাকে অন্ধকারে। মাঝে মধ্যে ওর প্রবল ইচ্ছে জাগে নিজেকে শেষ করে দেবার। শালা লাইনে ট্রেনের ও আকাল। শাসন করে চলেছে করোনার অনুশাসন পৃথিবীময়। হঠাৎ করে বিকাশ ঘুরঘুট্টি রাস্তায় চিৎকার করে ওঠে ‘আমাকে বাঁচতেই হবে।’ তারপর হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে দুহাতে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ে বড় রাস্তার ফুটপাতে।

অচেতন বিকাশ পড়ে আছে শিয়ালদহ ওভারব্রীজ থেকে নেমে আসা বেলেঘাটামুখী রাস্তার ফুটপাতে। ওদিকে সাইকেলে দুই আগন্তুক পল্লবী আর অরবিন্দ,পল্লবীর একহাতে ফোন ধরা, লাউড স্পিকার অন করে হাতটা সরিয়ে রেখেছে সে।বিরক্তিকর একঘেয়ে কথার ফুলঝুরি 'নভেল করোনা ভাইরাস কে রোধ করার জন্য', ইত্যাদি ইত্যাদি। হঠাৎ বেজে ওঠে রিং পল্লবীর মোবাইলে, অন্ধকার নিস্তব্ধ নিশুতি রাতের কান্নার মত আরেকটি ফোন বেজে ওঠে। শব্দের গতি অনুসরণ করে অরবিন্দর চোখ চলে যায় সেদিকে। সে দেখে ফুটপাতে পড়ে আছে অচেতন এক ব্যক্তি। অরবিন্দ পল্লবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পল্লবী ফোন কেটে দেয়,ফুটপাত থেকে আসা ফোনের শব্দও স্তব্ধ হয়ে যায়।আবার রিং করে পল্লবী, আবার কিছুক্ষণ সরকারী বাকওয়াসের পরে বেজে ওঠে ফুটপাতের ফোন পুনর্বার। তড়িঘড়ি সাইকেল স্ট্যান্ড করে ওরা ছুটে যায়। পড়ে আছে অচেতন বিকাশ। অরবিন্দ ছুটে রাস্তায় উন্নয়নের পানীয় জলের ট্যাংকের দিকে গিয়ে কল খুলে জল ভরার চেষ্টা করে। কাদা গোলা জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ল কিছুক্ষণ ধরে। লকডাউন ঘোষণার পর থেকে আর জল ভরা হয়নি ট্যাঙ্কে ।নিয়ন আলোর হলদে রঙের জলের রং আরও হলদেটে লাগে। এতেই চলে যাবে ওদের। অরবিন্দর চোখে মুখে ঝাপ্টা দিতেই বিকাশের জ্ঞান ফিরে আসে, অবাক চোখে তাকায় সে মনে হয় দুটো ভিনগ্রহের জীব হাজির তার কাছে। মানুষ তো এমন আকৃতির হয় না । পল্লবী জিজ্ঞেস করে ' আপনি বিকাশ দা?' ঘাড় নেড়ে সায় দেয় বিকাশ। ব্যাগ থেকে বার করে অরবিন্দ পাইপটা দেখায় বলে ক্লোজড পাইপ ক্যাথিটার আর কোন চিন্তা নেই। হাবার মত চেয়ে থাকে বিকাশ পল্লবী বলে যায় 'মেয়ের ওয়ার্ডে ডাক্তারকে পৌঁছে দিন এটা।' বিকাশ বলে 'ওরা আমায় ঢুকতে দেবেনা।কিন্তু আপনারা কারা, কোথা থেকে আসছেন?' পল্লবী বলে 'ক্যাপ্টেনস গ্রুপ তপনদা।' 'ব্যাস ব্যাস' বলে থামিয়ে দেয় বিকাশ, অরবিন্দ ততক্ষণে পাইপ নিয়ে আই. সি. সি.উ এর কাছে। জিনিসটা পৌঁছে দিয়েই সে ফিরে আসে চটজলদি খবর ও আনে ডাক্তারের কাছ থেকে- অনিতার টেস্ট করোনা নেগেটিভ আসার খবর। বিকাশের মাথায় তখনও রাতে মাথা গোঁজার চিন্তা। সে জানতে চায় 'আপনারা বলুন আমার কি করার আছে এখন।' অরবিন্দ বলে 'ঘাবড়াবেন না কমরেড আমরা আপনার বাসস্থানের ব্যবস্থা করে ফেলেছি।' থাকার ব্যবস্থা অবাক হয়ে যায় বিকাশ? 'এই অঞ্চলেই হয়ে গেছে যতদিন না মেয়ে সুস্থ হচ্ছে, থাকুন এখানে ততদিন।'

হালকা চালে সাইকেল দুটো ব্রিজে উঠছে ।নিয়ন আলোয় রাত্রি আলোকময় ,হঠাৎ করে ইলেকট্রিক সাপ্লাই রাস্তার সব আলো গুলো নিভিয়ে দিয়েছে। বিকাশের কেমন শিহরন জাগে শরীর জুড়ে। দুটি সাইকেলের মাঝ দিয়ে অনাবিল চাঁদ পেলব আলো ছড়াচ্ছে রাতের বুকে, যার থেকে নরম আলো চুইয়ে পড়ছে পল্লবী আর অরবিন্দর শরীর ছুঁয়ে বিকাশের চোখে।বিকাশ আর ডরায় না কোনকিছুকে। আচমকা বিকাশ আকাশে হাত দুটো ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে- এর মুলক হামারা হে , এ দেশ আমার।

কৃশানু মিত্র।

.....